অধুরি

আমার স্বামীর এককালে বাগান করার দারুণ ঝোঁক ছিল। তবে হাতেকলমে বাগান করার সুযোগ প্রথম এই পাঠানকোটে এসেই জুটেছে। এতকাল বড় বড় শহরের সার্ভিস ফ্ল্যাটে কেটেছে আমাদের। গায়ে গায়ে সাঁটানো বাড়ি, এতটুকু প্রাইভেসি নেই। পাড়াপ্রতিবেশীর সতর্ক সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনে বারোয়ারী জীবনযাপন। একতলা ফ্ল্যাটের সঙ্গে একফালি করে জমি যদি বা পাওয়া যায় স্যুট-বুট পরে কি আর কোদাল-খুরপি দিয়ে মাটি কোপানো চলে?

পাঠানকোটের কোয়ার্টার দেখে তাই আমরা মহাখুশি। বাংলো বাড়ি। বাড়ির আগে পাছে ঢালাও জমি ----- সামনে লন, পিছনে কিচেনগার্ডেন। আমার স্বামী তো তক্ষুণি মালকোচা মেরে নেমে পড়লো জমির তদারকে। মালী নিযুক্ত হল ---- বাক্স-প্যাঁটরা বউ ছেলেপুলে সমেত বিরাট গুষ্টিবর্গ এসে উঠলো আমাদের সারভেন্টস্ কোয়ার্টারে। ট্রাকবোঝাই খাদ আনিয়ে জমিতে ঢালা হল। গন্ধে বাড়িতে টেঁকা দায়। এরপর নানারকম সাজ সরন্জাম আসতে লাগলো প্রতিদিন ---- ঘাসকাটা তরোয়াল, কাস্তে খুরপি কোদাল হোজপাইপ। পাইপের মুখে লাগানোর নানারকম চোঙ্গা ---- সরু, মোটা, ঝারিদার। নানারকম বীজ আর গাছের চারা আনা হল। মহা সমারোহে তাদের বপন করে সযত্নে লালন পালন চলতে থাকলো। আমাদের সাগ্রহ বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে বীজ থেকে অঙ্কুর এবং চারাগাছে নতুন পাতা গজাতে লাগলো একটি দু'টি করে।

তখন শীতের মরসুম, নতুন সব্জিতে বাজার ছেয়ে গেছে। ফুলকপি বাঁধাকপি মটরশুঁটি বেগুন টমাটোয় আলো হয়ে আছে বাজারঘাট। আমরা তাদের দিকে ফিরেও দেখি না। থলে বোঝাই আলু পেঁয়াজ কিনে গট গট করে চলে আসি। আমাদের বাগানেই তো ওই সব লাগানো হয়েছে অঢেল। নিজেদের বাগানের ফসল দিয়েই ঋতুর নতুন শাক

সব্জির স্বাদ গ্রহণ করবো আমরা। একবার ফলতে শুরু করলে তখন আর আমাদের পায় কে? অধীর উৎসুকতায় রোজ ঘুরে ফিরে দেখি একাধিক বার। কেন যে এত দেরী হচ্ছে অকারণ! এরপর একদিন মালী এসে এক গোছা কচি মুলো দিয়ে গেল। আমাদের বাগানের প্রথম ফসল। আনন্দ কোলাহল পড়ে গেল বাড়িতে। নিজেদের খেতের জিনিস, এতটুকু ফেলতে প্রাণে সয়না। মুলোর গোড়া দিয়ে ডাল রাঁধলাম, বাকিটা সালাড হিসেবে পরিবেশন করলাম কাঁচের ফুলকাটা প্লেটে কায়দা করে সাজিয়ে। পাতা দিয়ে শাক রান্না হল। সেদিন খাবার টেবিলে মুলোদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছাড়া দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় ছিল না আর।

পরদিন মালী আরও একরাশ মুলো এনে হাজির করলো এবং এরপর প্রতিদিনই মুলোর স্তূপ এসে জমা হতে লাগলো রান্নাঘরে। মুলোর ডালনা, মুলোর অম্বল, মুলোর ঘন্ট, জলখাবারে মুলোভরা রুটি পরোটা। বন্ধুবান্ধব পাড়া প্রতিবেশী যার কাছ থেকে পারি মুলোর নতুন রেসিপি জেনে নেই, শাশুড়ি ননদ এবং মায়ের কাছে তড়িঘড়ি জরুরী চিঠি পাঠাই মুলো রান্নার নতুন পদ্ধতি লিখে জানাতে। বাজারে তখন পঞ্চাশ পয়সায় ছ'কিলো দরে মুলো বিকোচ্ছে। ঝি, জমাদার, গয়লা, ধোপা যাকেই দিতে যাই, মুচকি হেসে প্রত্যাখ্যান করে আমার সে উপহার। এদিকে খাবার টেবিলে রোজই খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। ছেলেমেয়েদের মুখে অন্ন রোচে না, আমাদের দু'জনেরও প্রায় সমান অবস্থা। এই করে যাহোক মার্চ এপ্রিল নাগাদ মুলোর পালা শেষ হতে বাঁধাকপিরা মাথা চারা দিয়ে উঠলো। দু'তিন মাস ধরে ---- ঘোর গরম কালে ---- স্রেফ বাঁধাকপি খেয়ে কাটিয়ে দিলাম আমরা।

আমার বড় ছেলে নন্তু অঙ্কে ফেল করলো সে বছর। আমাদের পরিবারে এরকম অঘটন এই প্রথম। আমার দেওর সেই সময় হাওয়া বদল করতে এসেছিল। সব দেখে শুনে রায় দিলো যে এ সবই নাকি সব্জি খেতের পরিণাম। বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে জোর জবরদস্তি করলে তার ফল ভাল হয় না। একথা শিশুবিশারদ ডক্টর বেঞ্জামিন স্পকের বইয়ে নাকি স্পষ্ট লেখা আছে। এর মধ্যে আরও গোলযোগ বাধলো। মালীর একপাল ছেলেমেয়ে সর্বদা হৈ-হুল্লোড় করে শান্তির বিঘ্ন ঘটাতো, কিন্তু ছোট বাচ্চাদের তো স্বভাবই তাই। এ নিয়ে আর কিছু বলিনি আমরা। মালীবউয়ের অহর্নিশি ছেলেমেয়ে ঠ্যাঙানো এবং তাদের

কান্নাকাটিও নিরুপায় হয়ে সহ্য করে এসেছি এ যাবৎ। কিন্তু এরপর নতুন এক উপদ্রব দেখা দিলো। মালীটা নিশ্চয়ই আগে থেকে পানাসক্ত ছিল তবে এতকাল চুপিসারে সারতো। ক্রমশ চক্ষুলজ্জা এবং ভয়ডর কেটে যেতে ভীষণ বাড়াবাড়ি শুরু করলো। সন্ধ্যা হলেই মাতাল হয়ে চিৎকার গালাগালি করতো, বউকে ধরে ঠ্যাঙাতে যেতো। বউ মানবে কেন, সেও উলটে চ্যালাকাঠ নিয়ে তেড়ে আসতো তাকে। বার কয়েক এরকম হবার পর ওদের বিদায় করা হল। আমার স্বামীর বাগানের মোহ ঘুচে গেছে আগেই। ওরা চলে যেতে কিছুদিনেই বাগানপাট আগাছায় ভরে গেল। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মাসান্তে একবার মেসের লোক এসে লনের ঘাস কেটে হেজ ছেঁটে ছিম্‌ছাম্‌ করে দিয়ে যায়। বাড়ির সামনেটাই তাদের এলাকা শুধু। পিছন দিকের জমি সাফ করার দায়িত্ব তাদের নয়। সেটা 'সাহেব'দের নিজস্ব মালীর কাজ। বাড়ির পিছনটা ক্রমেই জঙ্গল হয়ে উঠলো। কষ্টে সৃষ্টে কাউকে ধরে-পাকড়ে পয়সা দিয়ে মাঝেমধ্যে খানিকটা পরিষ্কার করিয়ে নিই। আবার দেখতে দেখতে লকলকিয়ে গাছপালা গজায়। বর্ষাকালে মাথা সমান এলিফ্যান্ট গ্রাসে ছেয়ে যায়। এদিকে মিলিটারি ক্যাম্পের মধ্যে চট করে লোকজন পাওয়া মুশকিল। রাস্তা থেকে যাকে তাকে ডেকে আনা চলবে না। গেটপাস চাই, গার্ডরুমের অনুমতি চাই। নানারকম সিক্যুরিটির প্রশ্ন উঠবে নতুবা।

এমনি সময় একদিনকার ঘটনা। ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেছে, কর্তা অফিসে। ঝি কাজ সেরে চলে গেছে। সকালের দিকে বৃষ্টি পড়ছিল বলে জামাকাপড় বারান্দায় মেলে দিয়ে গেছে। দুপুর নাগাদ বৃষ্টি থেমে রোদ উঠলো। ভিজে কাপড়গুলো উঠোনের দড়িতে মেলে দেবো বলে সবে উঠোনে নেমেছি, হঠাৎ হাতের কাপড় ফেলে লাফ মেরে আবার বারান্দায় উঠে পড়লাম। উঠোনের একপ্রান্তে তিনটে সাপ ! মাথা উঁচু করে ফণা দোলাচ্ছে। পুঁতির মত ছোট ছোট চোখে চেয়ে আছে নিশ্চল দৃষ্টিতে। সে দৃশ্য দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। খানিকক্ষণ ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ঘরে ঢুকে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় কারা যাচ্ছিল, ডেকে ব্যাপারটা জানাতেই লোকগুলো তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে এলো। সাপ তিনটে তখনো সেখানেই রয়েছে। একজোট হয়ে হেলছে দুলছে ধীরে ধীরে। বারান্দায় ছোটখাটো ভিড় জমে গেল।

সাপগুলোর ভ্রুক্ষেপও নেই।

সঙ্গের লোকগুলোকে বললাম, "ওগুলোকে মারবে না?"

একজন জিভ কেটে বললো, "নেহী মেমসাব, য়হ্ নাগিন হ্যায়।"

"তিনটেই"

"এক নাগিন, দো নাগ।"

আর একজন বললো, "না রে না, দুটো নাগিন, একটা নাগ।"

এক বুড়ো ওদের থামিয়ে বললো, "চুপ করো। ও তিনটেই নাগ। তোমরা তো ছাই চেনো।"

আরও খানিক ফণার নৃত্য দেখিয়ে ওরা সরসরিয়ে উঠোনের ওপাশে বাগানে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। লোকগুলোও চলে গেল। পাড়ার কয়েকজন মহিলাও এসে জড়ো হয়েছিলো।

মিসেস শঙ্কর বললো, "তোমার কপাল খুলে গেল মিসেস বাসু। সর্পদম্পতি যাদের আঙিনায় আসে তাদের সৌভাগ্যের লেখাজোখা নেই। কর্তার প্রোমোশন, ফরেন পোস্টিং, ভাল দাঁওয়ে জমি-টমি এমন কি লটারি পেয়ে দুম্ করে লাখপতি হয়ে যেতে পারো রাতারাতি।"

মিসেস ভাটিয়া বললো, "আমি শুনেছি সাপেরা নাকি বংশবৃদ্ধির অগ্রদূত।"

দমে গিয়ে বললাম. "অমন কথা বোলো না ভাই। এই বয়সে দারুণ একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

"কেন? কেন?"

মিসেস রিখি বলে, "কেন আবার ! তিনটে সন্তানের পর সব স্বামীরা যা করে থাকে বাসুও নিশ্চয়ই একটা স্থায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে। এখন একটা কিছু ঘটে গেলে জবাবদিহি করতে প্রাণ যাবে মিসেস বাসুর।"

মিসেস ভাটিয়া অপ্রস্তুত হয়ে বললো, "না-না, তবে আর বংশবৃদ্ধি হয়ে কাজ নেই। এই বেশ আছ, আজকালকার বাজারে।"

"কিন্তু জোড়া সাপ পয়া বলে, এরা তো তিনজন?"

"সে আর কি করা যাবে। ইয়াঙ্কিদের প্রভাবে সর্পকুলেও নৈতিক অধঃপতনের বাকি নেই আর। এ যুগের আবহাওয়াই এরকম।"

কফি খেয়ে গল্পগুজব করে চলে গেল ওরা, আর আমি সাপের ভয়ে

সিঁটিয়ে রইলাম।

কর্তা আর ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরলে বললাম সব। বাড়ির লাগোয়া জঙ্গল। তিনটে কেন, আরও কত বিষধর যে আত্মগোপন করে আছে ওখানে কে জানে। আজ উঠোনে এসেছিল, এরপর কবে বারান্দা পার হয়ে ঘরে ঢুকবে তার ঠিক কি?

স্বামী বললো, "ঠিক আছে, খোঁজ নেবো কোয়ার্টারে কাউকে পাওয়া যায় কিনা। বাগানটাগান আর চাইনা, শুধু নিয়মিত ঘাস আগাছা কেটে সাফ সুতরো করে রাখবে পিছনটা।"

পরদিন সকালেই একটা লোক এসে হাজির হল কোয়ার্টারের খোঁজে। মুখ চেনা। জিজ্ঞেস করতে বললো বিয়াল্লিশ নম্বরের মালী সে। ঘাবড়ে গেলাম। বিয়াল্লিশ নম্বরের মিসেস মহাজন ভারী দজ্জাল মহিলা। তাদের মালী ভাঙিয়ে নিলে ক্যাম্পে আর স্বস্তিতে বাস করতে হবে না আমাদের। আমার মুখ দেখে লোকটা বোধহয় আমার মনোভাব আঁচ করলো।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "আমার জন্যে নয়, আমার ভাইপোর জন্যে কোয়ার্টার চাই মেমসাব। ছেলেটা নতুন বিয়ে করে ফিরেছে দেশ থেকে। একখানা ঘর জোগাড় করে সংসার পাতবে।"

"দেশ কোথায়?"

"বিহারে। ভোজপুর জেলার লোক আমরা।"

আমার জীবনের অনেকগুলো বছর বিহারে কেটেছে। বিহারের প্রতি এখনও একটা দুর্বলতা আছে আমার। সেইক্ষণে কোয়ার্টারে বহাল হল ওর ভাইপো। বিকেলবেলা পদার্পণ ঘটলো ওদের। সাইকেলের কেরিয়ারে গোলাপফুল আঁকা স্টীলের নতুন হাতবাক্স আর পোঁটলাপুঁটলি বিছানাপত্তরের স্তূপ নিয়ে ধীরে ধীরে সাইকেল টানতে টানতে কালো লম্বামত একটা ছেলে, বছর উনিশকুড়ি বয়স হবে বড় জোর আর তার পেছনে একগলা ঘোমটা দিয়ে কলাবৌয়ের মত একটা বউ। ছেলেটার নাম হরভজন। আমাদের যোগ্য মালী। বাগানটাগান করার মত কর্মক্ষম নয়। মেসে কি একটা চাকরিতে লেগেছে সবে। বাকি সময়টা ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে থাকে। রান্নাঘরের পাশেই ওদের ঘরখানা। ঠুনঠান চুড়ির

আওয়াজ পাই। বউটাকে মাঝে মাঝে উনোন ধরাতে কি ঝাঁট দিতে দেখি। একহাত ঘোমটা টানা সবসময়, মুখখানা দেখতে পাইনি একদিনও।

সেদিন ভোর বেলা রান্নাঘরে চা বানাচ্ছি। জানলার বাইরে বউটাকে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখলাম। একহাতে ঘোমটা টেনে ধরে বমি করছে। সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে বমির তোড়ে। কয়েক মাস কেটে গেল। হরভজন বউ নিয়ে দেশে যাবে এবার। একমাসের ছুটি। মনে মনে হরভজনের সুবিবেচনার প্রশংসা করলাম। এই বিদেশে কে-ই বা দেখাশোনা করবে মেয়েটার, এসময় দেশে গাঁয়ে আপনজনের কাছেই যাওয়া উচিত তাদের।

একমাস কেটে গেল, দ্বিতীয় মাসও যায় যায়। হরভজন সেই যে ঘরে তালা লটকিয়ে চলে গেছে, আর কোনও খবর নেই তার। ওর কাকাকেও দেখিনা। কর্তাকে মেসে খবর নিতে বললে বিরক্ত হয়। বলে যাকগে, আর কিছুদিন দ্যাখো। তারপর গার্ডরুমে বললে ওরা ঘর খালি করে দেবে তালা ভেঙে। অবশ্য মুখে বললেও সত্যি সেটা করা যায় না হুট্ করে। কোন একটা বিশেষ কারণে আটকে পড়েছে দেশে, আসবে নিশ্চয়ই। তাছাড়া আগেই বলেছি বিহারের প্রতি মনে মনে ভারী একটা দুর্বলতা আছে আমার। গ্রাম্য সাদাসিধে ছেলেটা তার ঘোমটা টানা বউকে নিয়ে আবার আমাদের কোয়ার্টারে এসে থাকুক এটাই চেয়েছি। এখানকার কাউকে রাখলে সে যে কি রকম চালু লোক বেরোবে এবং নতুন কি উপদ্রব আরম্ভ করবে তার ঠিক কি?

ঠিক তিন মাসের মাথায় হরভজন ফিরলো। দেশ থেকে আমার শাশুড়ি এসে আমাদের কাছে রয়েছেন তখন। হরভজন এসে খানিক পরেই মেসে কাজে চলে গেল। রান্নাঘর থেকে টুংটাং আওয়াজ পেলাম। সে সময় কিছুদিন ভারী ব্যস্ত ছিলাম। আমার স্বামীকে কয়েক মাসের জন্য বিদেশ যেতে হবে। তার গোছগাছ, সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাত। শাশুড়ি আবার খুব আচারবিচার মানেন। ওঁর রান্নাবান্না নিরামিষ হেঁসেলে আলাদা করে করতে হয় আমায়। এর উপর সংসারের রুটিন কাজ, ছেলে মেয়ের হাজার বায়নাক্কা, লোক লৌকিকতা, সে সব তো আছেই।

হরভজন দেশ থেকে ফেরার পর মাসখানেক কেটে গেছে। নানা ব্যস্ততার মাঝে ওদের ছোট্ট ঘরসংসারের পানে চেয়ে দেখার ফুরসৎ পাইনি। রান্না করতে করতে কখনো জানলা দিয়ে ঘোমটা টানা বউটাকে দেখেছি এক আধবার, ওর চুড়ির আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু তা নেহাতই যান্ত্রিকভাবে, একেবারেই মনোযোগ দিইনি ওদিকে।

আমার স্বামী চলে যাবার পরের রবিবার। সেদিন সকালে বড্ড বেলা হয়ে গেছিল। ভাবলাম লুচি পরোটার হাঙ্গামা না করে আজ জলখাবারে বরং সুজির উপমা বানিয়ে দিই, তাড়াতাড়ি হবে। সাজসরঞ্জাম ঠিক করে নিয়ে কড়াই চাপিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল কারিপাতা নেই। গেটের বাইরে কারিপাতার জঙ্গল। ভাবলাম হরভজনকে বলি এনে দিতে। জানলা দিয়ে ডাক দিলাম। বউটা ঘোমটায় মুখ ঢেকে ঘাড় হেঁট করে বাসন মাজছিল। হঠাৎ কেমন অবাক লাগলো। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। আসমানী শাড়ির ভিতর থেকে ফুটফুটে ফরসা দু'খানা হাত ছাই দিয়ে ঘষে ঘষে পোড়া কড়াই মাজছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুলে দুলে মাজছে কড়াইটা আর হাত ভর্তি কাঁচের চুড়িতে টুং টাং ঝুম ঝুম করে আওয়াজ হচ্ছে।

ডাক শুনে হরভজন এসে দাঁড়ালো, 'জী মেমসাব।'

আমি তখন কারিপাতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি বউটার দিকে।

শাশুড়ি কি কাজে রান্নাঘরে এলেন। শুধোলেন, "কি হয়েছে বউমা?"

মেয়েটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হরভজনকে তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলাম, "ও কে?"

হরভজন থতমত খেয়ে বললো, "মেরি ঘরবালী।"

শাশুড়ি জানলার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "কি হয়েছে বউমা, কি বলছ তুমি?"

বললাম, "ওই মেয়েটা নাকি ওর বউ !"

উনি অবাক হয়ে বললেন, "ঠিকই তো, হয়েছে কি তাতে?"

বললাম, "কিন্তু ওর বউ তো অন্য। মুখ দেখিনি কোনদিন, কিন্তু ওর হাত দুটো কালো ছিল। এ তো দিব্যি ফর্সা।"

শাশুড়ি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন। আমার হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়লো।

হরভজনকে বললাম, "তোমার বউ তো বাচ্চা হতে গিয়েছিল, তবে সে বাচ্চাটা কোথায়? তার গলা তো পাইনি একদিনও, দেখিওনি তাকে।"

বউটা পোড়া কড়াই রেখে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়েছে। কলা বৌ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হরভজনের পিছনে। শুধু রঙই ফর্সা নয়, লম্বাতেও অনেকখানি তারতম্য মনে হল। ছুটির আগে যাকে দেখেছিলাম সে এর থেকে অন্তত ইঞ্চি দুয়েক খাটো ছিল মাথায়।

হরভজন মাথা নীচু করে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটছিল। কাঁধের গামছা দিয়ে কপাল মুছলো। তারপর মাটির দিকে চেয়ে উদাস গলায় বললো, "সে মরে গেছে মেমসাব।"

বুকটা ধড়াস করে উঠলো। বললাম, "ইস্, বাচ্চাটা মরে গেল?"

হরভজন বললো, "বাচ্চা আউর বাচ্চাকে মা দোনো মর গইল।"

"আর এ?"

"এই দূর বিদেশ থেকে বারে বারে গাঁয়ে যাওয়া কি আর চাট্টিখানি কথা মেমসাব? তিনদিন গাড়িতে কাটিয়ে তারপর আরায় নেমে বারো ক্রোশ দূরে গাঁ। সবাই বললো এসেছিস যখন একবারেই শাদীটা করে যা। আবার কবে ছুটি পাওনা হবে, ট্রেনভাড়া জোগাড় হবে, তার ঠিক কি? তাই আবার আমার শাদী দিয়েছে বাবা -মা ----।" গামছা দিয়ে মুখখানা ভাল করে মুছলো হরভজন।

আমার মুখে কথা জোগালো না।

শাশুড়ি বললেন, "তা এ বউটার নাম কি?"

"এর নাম এতোয়ারী মাইজী।"

"আর সেই বউটা? যে বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল?"

"তার নাম ছিল অধুরি।"

শাশুড়ি মৃদুস্বরে মন্তব্য করলেন, "অধুরি আবার কি নাম গো বউমা?"

বললাম, "হিন্দীতে অধুরি মানে যা শেষ হল না, অপূর্ণ অসমাপ্ত রয়ে

গেল।”

উনি চুপ করে রইলেন। খানিক পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন,“আহা!”